Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501044 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Multi-Voices of Sexuality in the Context of Jyotirindra Nandi's Short Stories
যৌনতার বহুস্বর: প্রসঙ্গ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটোগল্প

Dr. Biplab kumar Saha
Assistant Professor
Bengali Department
Siliguri Women's College, Siliguri

Received on: 15th May 2026
Accepted on: 28th May 2026

Abstract:
From his own quiet admission, it is evident that Jyotirindra Nandi began writing short stories in his childhood, a creative impulse that found early recognition with the publication of 'Nadi O Nari' (The River and the Woman) in Parichay at the early age of twenty-four. The story swiftly established his reputation, marking him as a keen observer of life's unspoken undercurrents. In the post-Independence period, his fiction turns inward to the urban middle class, uncovering a deep-seated hollowness beneath its orderly exterior. Having lived through famine, riots, epidemics, Partition, and the aftermath of global wars, he drew effortlessly from lived history, transforming experience into narrative with remarkable immediacy. His stories move swiftly to the core of human consciousness, exposing its distortions and layered complexities. What emerges is a portrait of a decaying society — economically strained, morally fatigued, and inwardly fractured — where desire, particularly sexual desire, appears in its stark and often unsettling forms. A study of selected stories reveals how these distorted impulses reflect the deeper malaise of the time, making Jyotirindra Nandi's fiction a compelling exploration of both individual psyche and collective degeneration.

Key Words:
Jyotirindra Nandi; post-Independence urban middle class; existential hollowness; social decay; economic distress; psychological realism; distorted sexuality; Bengali short fiction

মূল প্রবন্ধ

"মায়া একটানে গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে একপাশে ও-দুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও। এমনি জল দিয়ে কেচে দেবার ইচ্ছা। এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপটায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যেতে হাড় ও মাংসের স্থূল ও সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ-বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া

 © Santiniketan Sahityapath

ঢুকে গলা বুক পিঠ পেটে কোমর তলপেট উরু হাঁটু হাঁটুর নিচে পায়ের মাংসল ডিম দুটোকে সতেজ স্নিগ্ধ করে দেয়। আঁচলটা আর গায়ে রাখে না ও।"[১] উদ্ধৃত অংশটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' নামক গল্প থেকে নেওয়া। এখানে গল্পের নায়িকা মায়ার স্নানের দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যে দৃশ্য খানিকটা দূর থেকে বৃদ্ধ ভুবন সরকার লক্ষ করেছিল। মায়া যে কুয়োতে স্নানের জন্য এভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল ভুবনও সেই কুয়ো থেকে জল নিতে আসছিল। কিন্তু এমন দৃশ্য দেখার পর সে আর জল নিতে পারে নি। ভয়ে না লজ্জায় না অন্য কোনো কারণে সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা নেই। তবে প্রসঙ্গাত এরূপ দৃশ্যের সম্মুখীন হলে মনে হয় ১৮ থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের শরীরই নিজের সঙ্গো কথা বলে। হয়তো ভুবনেরও এরকম হয়েছে। নইলে সে কুয়ো পাড়ে আসতে পারবে না কেন? যেখানে মায়া তাকে বার বার আসতে বলেছে। কিন্তু ভুবন আসতে পারে নি। অবশ্য ভুবনকে দেখে মায়ার মনেই হয়নি যে লোকটা একজন পুরুষ, তারও মন রয়েছে, বিশেষ করে অবচেতন মন। তার মনে হয়েছে এই শীর্ণ লোকটা যেন ডুমুরতলার ওধারের পুরানো ভাঙা পাঁচিল কিংবা মৃত নিস্প্রাণ, ওই মাদার গাছটার মতো। অন্যদিকে "তিন বউ হারানো বুড়ো ভুবনের জরা জীর্ণ বুকে কিন্তু এখনও জেগে আছে তীব্র সৌন্দর্য পিপাসা। ফ্যাকাশে হলদে চোখ দুটো দিয়ে সে মায়াকে দেখে। জলে ভেজা মায়ার নগ্ন শরীরের অজস্র জল বিভাজিকা তার রক্তে ঢেউ ঢোলে।"[২] নারী শরীরের এরকম বিভাজন কিংবা পোশাকই হয়তো পুরুষ মনে বিকৃত কিংবা প্রকাশে অক্ষম যৌনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে যার থেকে এই বৃদ্ধ ভুবন সরকারও রেহাই পায় নি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটোগল্পে আমরা এরকমই বিকৃত যৌনাকাঙ্খার পরিচয় পাব, যা এক একটি স্তরের মধ্য দিয়ে তিনি উন্মোচন করেছেন। আর এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী শিল্পী। মানব চরিত্র উন্মোচনে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড তিনি সর্বত্র বজায় রেখেছেন। সেখানে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের কোনো তারতম্য নেই। সেখানে যেন সৃষ্টির রহস্য, নর-নারীর দেহজ সম্বন্ধ, তার শিল্পী সত্তাকে তীব্রতম আকর্ষণে আসক্ত করেছেন। মানুষের যে অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলি পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্বকালে উপস্থিত রয়েছে যা মানুষের রক্তের বা অস্তিত্বের সঙ্গো ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে — সেই চিরন্তন প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চিরকাল আবিষ্ট থেকেছেন। তাই তিনি তাঁর গল্পে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে শিল্পময় করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন — "মানুষের অন্ধকার জীবন, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের প্রয়াস, ব্যর্থতা ও সাফল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গল্পে নিপুণভাবে উদ্ধৃত। মনোগহনে আদিম প্রবৃত্তির লীলা চিত্রনে সকল ধরনের মানুষ সম্পর্কে নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টি পোষণে, সমস্ত রকম ভাববিলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় জ্যোতিরিন্দ্রর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।"[৩] তাঁর এই ধরনের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে কখনো কোথাও যেতে হয়নি। পঞ্চাশের দশকে তিনি যেমন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প লিখেছেন, তখন তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রেখে চারদেওয়ালের মধ্যেকার চিত্র তথা মানুষের মনের অবচেতনের বাসনাকেই অকপটে বলে গেছেন। সমালোচকের ভাষায় — "তাঁর গল্পে নরনারীকে তিনি প্রত্যক্ষ বস্তুজগত থেকে সংগ্রহ করেন এবং তাদের নিজস্ব শিল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রেণীভুক্ত মানুষ অপেক্ষা স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট মানুষকেই তিনি দেখতে ও দেখাতে চান।"[৪] তিনি মনে করেন মানুষের জীবনের সঙ্গো যৌনচেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। কেননা যৌনতা মানুষের আচরণের এক অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি। অর্থাৎ যৌন চেতনা মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। কিন্তু যখন এই যৌনতাই নিয়ম বহির্ভূত হয় বা অবৈধ হয়ে ওঠে তখনি তা বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ হয়ে যায়। আবার কখনো আমরা দেখি শিক্ষার অভাবে বা মানুষ যেমন নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে লোকলজ্জা বা ভয়ে বা সমাজের চাপে জোড় করে চেপে রাখতে চায় তখনি জন্ম নেয় বিকৃত মানসিকতার।

তীব্র সংগুপ্ত যৌনাবেগ ও অবদমিত কামনা আকাঙ্খা একজনকে কতটা বিকৃত রূপ দিতে পারে তা আমরা দেখতে পাই 'পাশের ফ্লাটের মেয়েটো' নামক গল্পে। নবদম্পতি রেবা ও তার অধ্যাপক স্বামীর ছোট্টো ছিমছাম সংসার। তাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে কুন্দ নামে স্বামী পরিত্যক্তা এক রূপসী মেয়ে। একে নিয়েই রেবার যত সমস্যা আর চিন্তা। কুন্দ সুযোগ পেলেই রেবার ঘরে আসে যখন তার স্বামী ঘরে থাকে না। আর এসেই নানা রকম ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে থাকে। দিনের পর দিন কুন্দর এই ঠাট্টা ইয়ার্কি ও সাহস ক্রমেই বাড়তে থাকে। কেননা কুন্দ সবসময় রেবা ও তার স্বামীর দাম্পত্য সম্পর্ক ও তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলে। নানারকম রসিকতাও করে। এই রসিকতা কখনো মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা প্রকাশেও সে দ্বিধা বোধ করে না, সেখানে সে শ্লীল-অশ্লীল বিচার করেনা। এমন কি কুন্দ রেবার কাছ থেকে রাত্রি যাপনের নানান প্রসঙ্গাও জানতে চায়। "হ্যাঁ ভাই, সুন্দর করে

© Santiniketan Sahityapath

খোপা বেঁধেছ। রাত্রে খোপা ঠিক থাকে?”[৫] রেবা লজ্জায় উত্তর দিতে না পারলে কুন্দ নিজেই বলে ওঠে, “আমি ঠিক বলতে পারি, রাত্রে কখনো মেয়েদের খোপা ঠিক থাকতে পারে না, ভেঙে যায়, খুলে যায়, হিহিহি।”[৬]এইসব ব্যাপার রেবার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। রেবা ভাবে সে আর কুন্দকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু রেবা তা কিছুতেই পারে না। একদিন বাধ্য হয়ে কুন্দকে সে বলেই ফেলে — “আর আমার ঘরে এসো না ভাই, আমি পায়ে ধরে বলছি।... আমি তোমার মতন মেয়ে নই, আমার রুচি অন্যরকম।”[৭] পরে রেবা কুন্দর সমস্ত কর্মকাণ্ডের কথা তার স্বামীকে জানায়। স্বামীর সঙ্গো এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সে বুঝতে পারে যে এসব আসলে কুন্দর অবদমিত কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশ। কেননা কুন্দ রেবার দাম্পত্য সম্পর্কের গোপন কথা টেনে এনে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে রসিয়ে রাখতে চায়। কারণ কুন্দ তো তার স্বামীর কাছ থেকে কিছুই পায় না যা একটা বিবাহিত নারীর জীবনে প্রয়োজন, সেদিক থেকে সে বঞ্চিত। তার অবচেতন মনের এই সুপ্ত বাসনা এতটাই প্রকট ছিল যে সে মাঝরাতে রেবার ও তার স্বামীর রাত্রি যাপনের দৃশ্য উঁকি দিয়ে দেখতেও সে দ্বিধাগ্রস্থ করে না।

অসহ্য যৌন উত্তেজনা একজন নিরীহ সরল অপরিণত ১৭ বছরে তরুণ পলাশকে কী ভয়ানক করে তুলতে পারে, ‘পতঙ্গ’ গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তা মুন্সিয়ানার সঙ্গো পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পে লেখক যেভাবে এই বিকৃত যৌনাকাঙ্খা তুলে ধরেছেন, অন্যত্র সেভাবে তা পাওয়া যায় না। নিচে এরকমই কতকগুলি দৃশ্য তুলে ধরা হলো,

১। “যেন রূপা আমার কথা শুনল না, কি শুনলে, ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। আমি তো আর চোখ দেখছিলাম না ওর। শুধু নিশ্বাসের সঙ্গো মৃদু শব্দ কানে এল। আর অনুভব করলাম আমার মাথার পেছনে রূপার শরীরের মৃদু চাপ। নরম এবং ঈষৎ উষ্ণ। গলা না বুক না। মনে হল বুক ও তল পেটের মাঝামাঝি একটা অংশ আমার মাথার ওদিকটায় চেপে ধরে রূপা পোলিশ সুন্দরীকে আর একবার মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। তখনই অবশ্য দেখা হয়ে গেল আর তখনই রূপা আমার শরীর থেকে আলগা হয়ে দাঁড়াল। যেন আমি সাহস ঘুরে বসতে, চোখ তুলে থাকাতে, ভাল করে রূপাকে দেখি।”[৮]

২। “আমি ওর অনাবৃত পিঠ দেখলাম। মেরু দাঁড়া। কাঁধ থেকে সায়ার কুঁচি পর্যন্ত বিলম্বিত মজবুত রেখা।”[৯]

৩। “তাই সেদিন স্নান সেরে ও যখন আবার ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় আমি কটমট করে তাকিয়ে দেখছিলাম ওর চিবুক গলা বুক কোমর। গোলমোহর ফুলের রঙের একটা সায়া পরনে। ভাজ করা সাদা তোয়ালেটা বুকের উপর রাখা। আর কোনো আবরণ নেই। আবার ওর বুকের দুপাশের কুড়ি বছরের পুরনো পাজর কটা চোখে পড়ল। আর সায়ার কুঁচির ওপর দিয়ে উকি দিয়ে থাকা বেলফুলের কুড়ির আকৃতির ছোট নাভিটা। কি, আমার কেমন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল নখ দিয়ে ওর নাভিটা খুটে দেই। তা হলে বুঝি অনেকগুলি পাপড়ি ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে।”[১০]

উপরের প্রত্যেকটি কথাই ১৭ বছরের যুবক পলাশের, অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তীর স্ত্রী রূপার প্রতি। পলাশ ছিল অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তীর প্রিয় ছাত্র। প্রিয় ছাত্র হবার সুবাদে তার গৃহে পলাশের অবাধ যাতায়াত। এর ফলেই পলাশ ড. চক্রবতীর স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয় যা উপরের দৃশ্যগুলি থেকে প্রমাণিত। রূপার রূপ যৌবন এবং শরীরী ইঙ্গিত পলাশের মনে আগ্নেয় গিরির জন্ম দিতে থাকে। একদিন রূপাদের ফ্লাটে গিয়ে পলাশ ওদের দাম্পত্য বাদানুবাদে জানতে পারে অঞ্জন চক্রবর্তী তার ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র নিশিথকে রূপার কাছ থেকে প্রশ্রয় চ্যূত করতে চায়। অবশ্য তাতে রূপাও সায় দেয়। কিন্তু পলাশের মূলধন ছিল অঞ্জনের বিশ্বাস। তাই রূপার রূপের আগুনে তাকে পতঙ্গ হয়ে মরতে হলো। কেননা যে নিশিথকে ড. চক্রবর্তী প্রশ্রয়চ্যূত করে, সেই নিশিথের সঙ্গো রূপার আবার সম্পর্ক থাকতে পারে এটা পলাশ মানতে পারে নি। তাইতো যেদিন সে নিশিথের প্রতি রূপার আদেশ পলাশ শুনতে পেয়েছে — ‘জল গরম হয়েছে নিশিথ’; সেদিন পলাশ ঠিক থাকতে পারে নি। তখন তার মনে হয়েছে যে রূপার যে আদেশ, তার রূপসৌন্দর্য গোপনে দেখার অধিকার একমাত্র তারই আছে। এজন্য নিশিথ ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলে পলাশ পাউরুটি কাটা ছুড়ি দিয়ে রূপাকেই শেষ করে দেয়। রূপা যখন কুড়ি বছরের দেহ দিয়ে পলাশকে উন্মাদ বানিয়ে দেয়, তখনো সরল পলাশ বুঝতে পারেনি যে তাকেই রূপার রূপশিখার প্রমত্ত পতঙ্গ হয়ে পুড়ে মরতে হবে। নিশিথ রূপার ফ্লাটে গোপন অভিসারে গেলেই পলাশের সামনে রূপার স্বরূপ উদঘাটিত হয়। তাই বাধ্য হয়ে রূপাকে হত্যা করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একটা অন্ধকার সেলে সে দিন কাটায়। এখানেও লেখক রূপার যৌন কামনার পাশাপাশি পলাশের যৌনকামনা ও সেই কামনা থেকে জাত এক মনস্তাত্ত্বিক বিকার-গ্রস্থতার চিত্র সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন।

শিক্ষার অভাবে যৌনতা কখনো কখনো কীভাবে মানুষের রুচিবিকারে পরিণত হয় তাই আমরা দেখতে পাই 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পের মধ্য দিয়ে। গল্পের মূল চরিত্র উমেশ যমন নিজের পরিচয় গোপন রেখে খালপোলের উপর ইটের গুড়া কিংবা কাঠ কয়লা ঘষে ঘষে লতা পাতা, ফুল, মাছ, পাখির ছবি আঁকে অথবা চন্দ্রসূর্য সমুদ্র পর্বতের প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলে তখন সেগুলি দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময় বিমুগ্ধ আলোচনার খোরাক হয়। আবার উমেশ-এর পর সেই স্থানেই যখন লতা পাতার ছবির পরিবর্তে বিভিন্ন পতঙ্গের ছবি আঁকে তখন সেই দর্শকদের কাছে তা আর নতুন বলে মনে হয় না। তাদের সেই আগ্রহ সাময়িক থাকে। কিন্তু শিল্পী যখন হঠাৎ করে সেইসব পতঙ্গের পরিবর্তী একদিন সকলের অগোচরে নগ্ন নারী পুরুষের চিত্র অঙ্কন করে তখন সেইসব ছবি সকলকে লজ্জা এনে দেয়। সকলেই বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত চুপি চুপি সেই সব চিত্র দেখে আনন্দ উপভোগ করে। অথচ বাইরে চিত্রশিল্পীর রটনা করে। এভাবেই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে অশ্লীল ছবি দেখার জন্য। গ্রাম ও শহরের সর্বস্তরের লোকেরা যেন চুটিয়ে উপভোগ করতে থাকে এই সকল ছবি। এরই মধ্যে যে বৃদ্ধ পূর্বের ছবিগুলিকে শিল্পের আখ্যা দিয়েছিল। "এই শিল্পী সাধারণ মানুষ না। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন কোনো পুরুষ হবে।"[১১] সেই বৃদ্ধই এবারে বলছে, "তাই বলছিলাম ভাই, দুর্নীতি, চতুর্দিকে পাপ। বৃদ্ধ ঘামছিলেন, উত্তেজনার কাপছিলেন। একটু হাওয়া খেতে ব্রিজের দিকে বেড়াতে আসি। এখন দেখছি তাও বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে যদি কেউ চিত্র বিদ্যা পোলের উপর ফলাতে থাকে তো আমরা যাই কোথায়।"[১২] স্বাভাবিকভাবে এরা চিত্রকরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হয়তো চিত্রকরকে কাছে পেলে মেরেই ফেলবে। বাস্তবিকই একদিন সেরকম দিন উপস্থিত। উমেশ সেদিন শুধু পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। পরমুহূর্তে পুলিশ এসে সেই ছবিগুলি উপভোগ করে। এভাবেই লেখক এখানে মানুষের অন্তরের অবচেতন মনের প্রবৃত্তিকে জুম করে সকলের সামনে তুলে ধরেন। এরপর চিত্রশিল্পী উমেশের বাজারে ছবি বিক্রি করার দৃশ্য নজরে আসে। সেখানে ভালো ভালো ছবির ভিতর নগ্ন নর-নারীর ছবিও সে রাখে। কেননা খাল পোলে নগ্ন নর-নারীর চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে সে মানুষের চাহিদা বুঝতে পেরেছে। এই বিকৃত যৌনবাসনা নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নান্দীর আরো অনেক গল্প আছে। 'মঙ্গলগ্রহ', 'বন্ধুপত্নী', গিরগিটি প্রভৃতি এই বিষয়ের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে লেখক যৌন প্রবৃত্তির অপর একটি দিক উন্মোচন করেছেন। পার্কার এন্ড পার্কার কোম্পানীর কেরানি কুলদারঞ্জন পাইনের দুঃখকষ্ঠের সংসারে সর্বদা রোগ ব্যাধি লেগেই আছে। কেননা তার স্ত্রী হেমলতা ছিল বাতের ব্যথায় পঙ্গু। এছাড়াও উপরন্ত দুই আইবুড়ো মেয়ে এবং পড়াশুনায় অমনোযোগী এক ছেলে রয়েছে। এমন সময় তাদের পাশের ফ্ল্যাটে প্রতিবেশি হয়ে এল এক নবদম্পতি। তাদের বিলাসিতা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ সবাইকে চমকে দেয়। নবগতা যুবতি বধূ লীলাময়ীর রূপে প্রৌঢ় কুলদারঞ্জন মুগ্ধ হয়ে যায়। লীলাময়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় তার মধ্যে। আর কুলদারঞ্জনের সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে লীলাময়ী। ফলে রূপসী যুবতী লীলাময়ীর ছলাকলার কুলদারঞ্জন তার ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কুলদারঞ্জনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লীলাময়ীর স্বামী যখন তাকে দিয়ে কাট ফাটিয়ে নেয় তখনো তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ফুলে ওঠে না। তখনো সে লীলাময়ীর স্বপ্নে বিভোর থাকে। কারণ আত্মবোধ কিংবা স্বতন্ত্র জেগে উঠলে সে এভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব হারাতো না। এখানেও যেন সে অনেকটা পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পের কুন্দের মতো। স্ত্রী থাকা সত্বেও কুলদারঞ্জন যৌন সুখ থেকে বঞ্চিত। কেননা তার পঙ্গু স্ত্রী সেই সুখ মেটাতে পারে না। এজন্যই তার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা লীলাময়ীকে দেখে চাড়া দিয়ে ওঠে। তার Personalityকে ভুলিয়ে দেয়। তার মধ্যে এই শরীরী প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে বলেই কাপড়ের খুট দিয়ে লীলাময়ীর গালে, মাছের রক্ত মুছে দিতে তার হাত কেপে ওঠে। "দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ। বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের একটা ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে। নাকের পাশে। হাতের পিট দিয়ে ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বার বার।

'আরেকটু নিচে।' রূদ্ধশাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছালো না।

'হলো না,' বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন-না মুছে'। কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকালো। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হলো গালে ওর রক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাপছিল আমার, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিতে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।"[১৩] অথচ এই স্পর্শে লীলাময়ীর কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় নি। সে কুলদারঞ্জনকে ব্যবহার করেই যেন আনন্দ পায়। অন্যদিকে কুলদারঞ্জন তার বৃদ্ধ বয়সেও পরস্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় মেতে ওঠে। এও যেন বিকৃত মানসিকতা বা বিকৃত যৌন চেতনার নামান্তর।

© Santiniketan Sahityapath

‘বন্ধুপত্নী’ গল্পেও এরকম দৃশ্য নজর আসে। সুধাংশুর স্ত্রী রেবা তাকে ছেড়ে চলে যায়। এরপর অসুস্থ সুধাংশু নিজের বিবর্ণ জীবনটাকে নিয়ে কোনো রকমে দিন কাটায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু সুবিনয় তার এহেন অবস্থা সহ্য করতে না পেরে নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়। এতে সুবিনয়ের স্ত্রীও আপত্তি করে না। আর এতেই বোধ হয় ঘটনা ভিন্নমাত্রা লাভ করে। কেননা গল্পপাঠে আমরা জানি স্বামীর সংকীর্ণতা ও নীচতা সহ্য করেও অরুণা সুবিনয়ের যৌন সুখ মেটায়। যৌন উপবাসী সুধাংশুর কাছে তা দুঃসহ হয়ে ওঠে। তার অন্তরের অবচেতনে যে যৌনবাসনা রয়েছে অরুণাকে দেখার পর তা ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকে। কেননা সুধাংশু যা নিজের স্ত্রীর মধ্যে খুঁজে পায়নি, তা যেন সে খুঁজে পেয়েছে বন্ধুপত্নী অরুণার মধ্যে। তাই একদিন মাঝ রাতে সুধাংশু অরুণার কাছে আসে এবং হিংস্র জন্তর ন্যায় অরুণার হাত চেপে ধরে। আর অরুণাও তার হাত সুধাংশুর কাছ থেকে সরানোর চেষ্টা করে না। শুধু বলে সুধাংশুর টাকা পেয়ে গেলে তার স্বামীর জামাকাপড় কিনতে হবে। কারণ তার স্বামীর পোশাকের ভীষণ দুরবস্থা। এতেও যেন আমরা দেখলাম গুপ্ত যৌনবাসনা কতখানি আকৃষ্ট করেছে বন্ধুপত্নীর নিকট। সুধাংশু হয়তো তার বন্ধুপত্নী অরুণার মধ্যদিয়ে নিজের মনোবাঞ্ছা ও কামনা বাসনা পূরণ করতে চেয়েছিল। এতে অরুণা কিছুটা সম্মত ছিল। কেননা এতে একজনের তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যজনের অভাবের তাড়না — এই দুইই গল্পে বিকৃত প্রবৃত্তির পরিচয় বহন করে। তাই সমালোচকেরা বলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে প্রেম থেকে প্রেমহীনতাই বেশি লক্ষ করা যায়। আর তার ফল যে মারাত্মক সেকথাই তিনি বিভিন্ন বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। বিশেষ করে ‘পতঙ্গ’ গল্পে পলাশ, ‘পাশের ফ্ল্যাটে মেয়েটা’ গল্পের কুন্দ, কিংবা ‘মঙ্গলগ্রহ’ গল্পের কুলদারঞ্জন। সবার মধ্যেই আমরা এক অস্বাভাবিক যৌন চেতনার ছাপ দেখতে পাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সভ্যতা মানসিকতা সব কিছু পরিবর্তন হলেও মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তি কিন্তু এখানে একই থেকে গেছে। এই প্রবৃত্তিকে যে চেপে রাখা যায় না, সময় পেলেই বা সুযোগ পেলেই তা যে বেরিয়ে আসে সে কথাই প্রমাণ করে এই গল্পগুলি যা দেখে আমরা ঠিক বেঠিক কিংবা উচিৎ অনুচিতের হিসেব মেলাতে পারি না। লেখক যেন এইসব অবচেতন মনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে পাঠকদের প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ‘খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর’ গল্পটিও সেদিকের ইঙ্গিত বহন করে।

তথ্যসূত্র:

১। ‘জোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প’, নিতাই বসু সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৮, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১১০

২। ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা ১৪১৭’, উজাগর (পত্রিকা), উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত, হাওড়া, পৃ. ২১৬.

৩। ‘কালের পুত্তলিকা’, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪

৪। ওই, পৃ. ৩৭৪

৫। ‘জোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প’, নিতাই বসু সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৮, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪৪

৬। ওই, পৃ. ২৪৫

৭। ওই, পৃ. ২৮৯

৮। ওই, পৃ. ২৩৪

৯। ওই, পৃ. ২৩৫

১০। ওই, পৃ. ৩৩৭

১১। ওই, পৃ. ২২৫

১২। ওই, পৃ. ২২৮

১৩। ওই, পৃ. ১৮২

—

© Santiniketan Sahityapath